ইসলামের জন্ম ও হজরত উসমানের (রাঃ) যুগ

আকাশ মালিক

(৪)

পূর্ব প্রকাশিতের পর

হজরত উসমান (রাঃ) কর্তৃক এতদ্‌যাবত মিশর, কুফা ও বসোরার ক্ষমতাচ্যুত শাসকগণ যখন দলবদ্ধ হয়ে খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পরিকল্পনা করেন, উসমান (রাঃ) তখন বৃদ্ধ বয়সে ক্ষমতায় আরো কিছুদিন টিকে থাকার লক্ষ্যে, কোরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। সেই ওমরের (রাঃ) খুনী পুত্রের বিচার থেকে আজ পর্যন্ত প্রজাগণ উসমানের (রাঃ) রাষ্ট্র পরিচালনায় কোরআনের শারীয়া আইন অনুসরণের উদাহরণ দেখেনি। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সাধারণ মানুষ খলিফার কোরআন সংকলনের উদ্যোগে সন্দিহান না হয়ে পারলোনা। হজরত উসমান (রাঃ তাঁর দুধ ভাই, মিশরের অধিপতি, আল্লাহ্‌র বাণী কোরআনে অবিশ্বাসী, আবদুল্লাহ্‌ বিন সা'দ বিন আবি সারাহকে (রাঃ) কোরআন সংকলন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করলেন না।

নবী মোহাম্মদ (দঃ) লিখতেও পারতেন, পড়তেও পারতেন। কিন্তু নিজে কোরআন লিখেন নাই। তাঁর মুখনিঃসৃত কথা, স্বর্গীয়-বাণী বলে দাবীকৃত বিধায় উপস্থিত শ্রোতা যে যেভাবে পারেন, স্মরণ রাখার চেষ্টা করতেন। কেহ কেহ তাঁর কথা, পাথরে, খেজুর পাতায়, কাগজে, পশুর চামড়ায় ও কাঠের টুকরায় লিখে রাখতেন। তাওরাত, জবুর ও ইনজীল কিতাব অনুসারীদের কাছ থেকে মোহাম্মদের (দঃ) শোনা ঘঠনাবলী ও মোহাম্মদের (দঃ) কাছ থেকে মানুষের ঐ শোনা কথা, বিভিন্ন বস্তুতে, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাক্য সমুহই কোরআন। কোরআন সম্পাদনায় মুহাম্মদকে (দঃ) যারা সাহায্য করেছিলেন তাদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনের কাব্যিক ছন্দ, শব্দ-বিন্যাস, ততকালীন এবং ইসলাম পূর্ববর্ত্তি আরবীয় একাধিক কবি সাহিত্যিকদের কাছ থেকে ধারকৃত। একদিন নবীজীর কনিষ্ঠ কন্যা হজরত ফাতিমা (রাঃ) কোরআনের সুরা ক্বমর (চাঁদ) আবৃত্তিকালে ইমরুল কায়েসের মেয়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। কায়েসের মেয়ে রাগান্বিত হয়ে ফাতিমাকে (রাঃ) বল্লেন- *'সর্বনাশ, এটাতো আমার বাবার লিখা একটি কবিতার পংক্তি। তোমার বাবা, আমার বাবার কবিতা নকল করে আল্লাহ্‌র বাণী বলে কোরআনে ঢুকায়েছেন।'* খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ইমরুল কায়েসের ধর্মীয় ভক্তিমুলক কবিতাগুচ্ছ মুহাম্মদের (দঃ) জন্মের পূর্বে লিখা। মুহাম্মদ (দঃ) কখন কি ভাবে ঐ কবিতা সংগ্রহ করেছিলেন তা আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

গ্রন্থাকারে কোরআন তৈরী করার ধারণাটা প্রথম আসে হজরত ওমরের (রাঃ) মাথায়। হজরত ওমর (রাঃ) খলিফা আবুবকরকে (রাঃ) এ ব্যাপারে প্রস্তাব দিলে আবুবকর প্রথমে রাজী হননি। আবুবকর (রাঃ) জানতেন বিষয়টা স্পর্শকাতর ও কষ্ঠসাধ্য ব্যাপার। উসমান (রাঃ) যখন পুনরায় এ উদ্যোগটা নিলেন, তখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সিরিয়া, কুফা, বসোরা, আজারবাইজান, মিশর সহ বিভিন্ন এলাকার কোরআন, আর মদীনায় ওমরের (রাঃ) নির্দেশে তৈরী, তাঁর মেয়ে মোহাম্মদ-পত্নী হাফসার কাছে গচ্ছিত কোরআনের মধ্যে বিস্তর তফাত। সেচ্ছাচরী, স্বৈরাচারী, জগতজুড়ে মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপথ্য বিস্তারের উচ্চাবিলাসী, কোরায়েশ শাসকগণ তাঁদের প্রজা নির্যাতন, অপশাসন ও শোষনের বৈধতা যখন কোরআনিক নির্দেশ বলে দাবী করতেন, তখন নির্যাতিত শোসিতেরা কোরআন দিয়েই প্রমান করার চেষ্টা করতেন, শাসকেরা তাঁদের স্বার্থানুযায়ী

কোরআনে পরিবর্তন পরিবর্ধন এনেছে এবং তাঁরা কোরআনের ভুল ব্যখ্যা করে। সাহাবী হজরত আবু জওহর গিফ্‌ফারী (রাঃ) সিরিয়ার স্বৈর-শাসক হজরত মোয়াবিয়াকে (রাঃ) সরাসরি কোরআন বিরোধী শাসক বলে অভিযোগ করেন। আবু জওহর কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বল্লেন- *'আপনি যে জনগনের সম্পদ দিয়ে রাজ-প্রাসাদ গড়ে তুলেছেন এবং রাজকীয় বেশে বিলাসবহুল জীবন কাটাচ্ছেন তা কোরআনের পরিপন্থি।'* মোয়াবিয়া (রাঃ) আবু জওহর গিফ্‌ফারীকে (রাঃ) ধমক দিয়ে বল্লেন- *'বে-কুবের দল, রাষ্ট্রীয় আয় ও যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের মালিক জনগন নয়। সকল সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌ই আমাকে তাঁর সম্পদের রক্ষক হিসেবে মনোনীত খলিফা করেছেন। সম্পদ ব্যবহার হবে খলিফার ইচ্ছানুযায়ী জনগনের নয়।'*

জনগনের কাছে যখন সারা মুলিম সাম্রাজ্যের সকল প্রাদেশিক গভর্ণর সহ স্বয়ং খলিফা উসমান কোরআন বিরোধী, অনৈসলামিক শাসক বলে বিবেচিত, তখন উসমানের (রাঃ) কোরআন-সংকলন মানুষের কাছে কতটুকু সমাদৃত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। উসমান (রাঃ) হজরত যায়িদ বিন সাবিত (রাঃ) কে সর্বপ্রধান করে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে যোবায়ের, সা'দ ইবনুল আ'স এবং আব্দুর রহমান বিন হারেস সহ ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কোরআন-সংকলন কমিটি গঠন করলেন। নির্দেশ দিলেন, মদীনার ওহী লেখকদের সাথে যদি ভাষাগত মতানৈক্য দেখা দেয় তাহলে কমিটি যেন কোরায়েশদের ভাষা অনুসরণ করে। খলিফা আরো বল্লেন- *'এই কমিটি কর্তৃক প্রণীত কোরআনই হবে সরকার অনুমুদিত পরিপূর্ণ বৈধ কোরআন এবং রাজ্যের অন্যান্য সকল কোরআন অবৈধ বলে গন্য হবে।'* কোরআন লিখা হলো। উসমান (রাঃ) কমিটিকে কোরআনের ৭টি কপি তৈরী করতে আদেশ দিলেন। ৭টি রাজ্যে কোরআনের ৭টি কপি পাঠিয়ে তথাকার বাকীসব কপি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দিলেন। বেসরকারী সকল কোরআন পুড়িয়ে ফেলা হলো। এবারে আরব-অনারব, হাশিমী-উমাইয়া, কোরায়েশ-অ-কোরায়েশ নয়, রাজ্যের সকল প্রদেশের সকল এলাকা থেকে, সকল সমাজের সর্ব স্তরের মানুষ, খলিফার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলো। খলিফা উসমান (রাঃ) ১২টি বৎসর খেলাফত কালের পূর্ণ ১০টি বৎসর যুদ্ধ-বিগ্রহ করে কাটিয়েছেন। অন্যায়ভাবে বিরাট ভূ-খন্ড দখল করা হলো, যশ, মান পদোন্নতি, জগতের অফুরন্ত ধন-ভান্ডার, সম্পদ, দাস-দাসী সবই পদানত করা হলো। তবু, হায় ! হায়রে শান্তির ধর্ম ! হায়রে সাম্যের ইসলাম ! অগণিত নিরপরাধ নারী, পুরুষ শিশুর প্রান সংহার করে, এতসব মানব-রক্ত পান করেও তার রক্ত-পিপাসা নিবারণ হলোনা। ইসলাম এবার নিজের রক্তপান করতে উদ্যোত হলো। রাজ্যের সকল এলাকা থেকে সরকার বিরুধী সংগঠন গড়ে উঠলো। তাদের এক দফা, এক দাবী। স্বৈর-শাসনের পতন হউক। সর্বদলীয় সংগ্রামের নেতৃত্বে যারা এগিয়ে আসলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নীচে দেয়া হলো।

হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর (রাঃ)- হজরত মুহাম্মদ ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা, নবী মুহাম্মদের (দঃ) অতি প্রীয়ভাজন সাহাবী হজরত আবুবকরের (রাঃ) কনিষ্ঠ পুত্র। আবুবকরের (রাঃ) মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী, শিশু পুত্র মুহাম্মদকে নিয়ে হজরত আলীকে (রাঃ) বিয়ে করেন। আবুবকরের (রাঃ) স্নেহের সন্তান, নবীজীর প্রীয় স্ত্রী বিবি আয়েশার (রাঃ) আদরের ভাই মুহাম্মদ ছিলেন যথেষ্ঠ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অধিকারী। হজরত আলীর পোষ্যপুত্র মুহাম্মদ, তৃতীয় খলিফা নির্বাচনে, হজরত ওমরের (রাঃ) নির্বাচন কমিটির ওপর চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও স্বজন-প্রীতির অভিযোগ করেছিলেন। উসমানের (রাঃ) খেলাফত লাভের পরপরই তাঁর অদক্ষ রাষ্ট্রপরিচালনা, অন্যায় শাসন সহ্য করতে না পেরে মুহাম্মদ মদীনা ছেড়ে মিশর চলে যান।

হজরত মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা (রাঃ)- রাসুলুল্লাহ্‌র (দঃ) বিশেষ সম্মানিত সাহাবী হজরত আবু হুজাইফার (রাঃ) পুত্র মুহাম্মদ। তাঁর পিতা ইয়ামামার যুদ্ধে (আবুবকরের আমলে) মৃত্যুবরণ করার পর থেকে খলিফা উসমানেরই (রাঃ) গৃহে প্রতিপালিত হতে থাকেন। বড় হয়ে মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা (রাঃ) বুঝতে পারলেন, ইসলাম প্রচারের নামে জগত জুড়ে যে অত্যাচার-অনাচার চলছে তা কোন ভাবেই ধর্ম-সমর্থিত হতে পারেনা। স্বদেশ ত্যাগ করে মুহাম্মদ মিশরে চলে আসেন। মিশরের আদিম অধিবাসী কীবতি সম্প্রদায় কোরায়েশদের প্রভুত্ব সহ্য করতে পারতোনা। মুহাম্মদ মিশরের নির্যাতিত নিপিড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি মিশরের গভর্ণর আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ'র দিকে ইঙ্গিত করে, চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন শাসকদের বিলাসিতাপ্রীয়, কোরআন-হাদীস বিমূখ আসল চেহারা। মিশরে মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর ও মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফা এই দুই মুহাম্মদ, সুদীর্ঘ ১২টি বৎসর অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলতে থাকেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'বা- হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'বা বিলাসবহুল জীবন ঘৃণা করতেন। ক্ষমতা ও অর্থের প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিলনা। তিনি হজরত আলী (রাঃ) কে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, হজরত আলীর (রাঃ) ভেতর নবী মুহাম্মদের (দঃ) সকল প্রকার গুনাবলী বিদ্ধমান বিধায় নবীর মৃত্যুর পর হজরত আলীই প্রথম খলিফা হওয়ার কথা। পরপর তিনজন খলিফা জবরদস্তি ও অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। বসোরায় আব্দুল্লাহ ইবনে সা'বা তাঁর এই বিশ্বাসের পক্ষে প্রচারণা করতে থাকেন। বসোরার গভর্ণর আব্দুল্লাহ বিন আমীর, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'বাকে তার দেশ থেকে বহিস্কার করে দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সা'বা কুফায় চলে যান। সেখানে হজরত আলীর বহু সমর্থক ছিল। বসোরা ও কুফায় তাঁর বিশ্বাসের প্রতি প্রচুর লোক সমর্থন জানায়। অতঃপর আব্দুল্লাহ সিরিয়া গমন করেন। সিরিয়ায় তখন উসমানের উমাইয়া বংশীয় সরকার হজরত মোয়াবিয়ার যাঁতাকলে, হাশিমী বংশের শাসরুদ্ধকর অবস্থা। পরিশেষে সিরিয়া ত্যাগ করে আব্দুল্লাহ মিশরে মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর ও মুহাম্মদ ইবনে আবু হুজাইফার সাথে মিলিত হন। এখানে তিনি 'সাবায়ী' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্টিত করেন।

সারা মুসলিম বিশ্বে যে স্বৈরাচারী-শাসকদের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করছে, হজরত আলী তা আঁচ করতে পেরে খলিফা উসমানকে কতকগুলি সুক্ষ্ম পরামর্শ দিলেন। ক্ষমতা ও সম্পদের লোভে মানুষ যে কত অন্ধ হতে পারে, ৮০ বৎসর বয়স্ক হজরত উসমান তার প্রকৃষ্ট প্রমান। তিনি আলীর পরামর্শ গ্রাহ্য তো করলেনই না বরং বিদ্রোহের প্ররোচনাকারী বলে হজরত আলীকে অপবাদ দিলেন। দেশের পরিস্থিতি দিনদিন খারাপ হতে থাকে। সমগ্র দেশটা গণ-আন্দোলনের বিস্ফুরণ অবস্থায় দেখেও হঠাৎ করেই উসমান নতুন একটি প্রথার উদ্ভব ঘঠালেন।

প্রজাস্বত্বের হস্তান্তর, জায়গীরদারী ও জমিদারী প্রথা-
দুটি উদ্যেশ্যে হজরত উসমান এ কাজটি করেছিলেন। (১) স্বগোত্রীয় বিত্তশালী লোকদের সমর্থন অর্জন। (২) গরীব প্রজাদেরকে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর, আর কৃষকদেরকে ভূমিহীন করণ।
তাঁর ধংসমুখী আইনের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করালেন এই বলে- *'দেশে মাত্রাতিরিক্তভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর তুলনায় নিম্নশ্রেণীর লোকের সংখ্যা বেশী হয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে নাগরীক সভ্যতা ও শালীনতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। দেশে নবাগত মুসলিম অধিবাসীদের বেশীর ভাগই যাযাবর-*

বেদুঈন কিংবা গ্রাম্য অনারব। এরা মূর্খ ও বর্বর। এদের রুচী আচরণ কদর্য, অভদ্র ভাষা, অসভ্য ব্যবহার ও রীতি-নীতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ। এদের দ্বারা দেশের শান্তি বিপন্ন হচ্ছে।'

আসলে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে। ধর্ম প্রচারের নামে খুন, লুট, ডাকাতীকে আরবগণ পেশা হিসেবে গ্রহন করে নেয়। ডাকাতি শুধু লাভজনক একটি বৈধ ব্যবসাই নয়, পুণ্য কাজ বলেও শাসকগণ প্রচারণা করতেন। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে ইসলাম ধর্ম কবুল করে দস্যুতা গ্রহন ছাড়া কোন গতি ছিলনা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দলে দলে মুসলমান হলো, সৈনিকদলে যোগদান করে লুটকৃত সম্পদের অংশীদার হলো, সাথে নিয়ে আসলো কুসংস্কার, বিশৃংখলা, অশ্লীলতা, উচ্ছৃখলতা, অজ্ঞতা ও অরাজকতা। তাছাড়া ক্ষমতাশীল, বিত্তবান সাহাবীগণের যৌনক্ষুধা নিবারণের লক্ষ্যে গণিমতের মাল হিসেবে রক্ষিতা, যুদ্ধ-বন্দী নারীগণ, তাঁদের গর্ভজাত জারজ সন্তানাদি সমাজ ও শাসকদের জন্য উপদ্রব হয়ে দাঁড়ায়।

উসমানের *'প্রজাস্বত্বের হস্তান্তর, জায়গীরদারী ও জমিদারী প্রথা'* নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ে নিমজ্জিত একটা জাতীকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে চালু করা হয় নাই, সে কথা বুঝতে কারো বাকী রইলোনা। বেশ কয়েকজন সাহাবী এর প্রতিবাদ করলেন। প্রাক্তন বিশিষ্ঠ সাহাবীগণ অভিমত প্রকাশ করলেন, শরিয়ত বিরোধী এ সরকারকে উৎখাত করতে না পারলে মুসলিম জাতী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সর্বোপরি ইসলাম দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যাবে। এবারে নবীজীর আমলের খ্যাতনামা সাহাবী, দেশের বরণ্যে উলামাগণ বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন। এমনকি এক কালে উসমানের ডান হাত হজরত তালহা (রাঃ), হজরত যোবায়ের (রাঃ), কুফার কোষাধক্য সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) সহ বহু সংখ্যক সাহাবী ও সরকারী কর্মচারী খলিফার বিরুদ্ধে চলে যান। উসমান কঠোর দমন-নীতি অনুসরণ করলেন। কয়েকজন সাহাবীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেন, কিছু লোককে প্রাসাদে ডেকে এনে স্বহস্তে অমানুষিক নির্মম শাস্তি প্রদান করেন। বিদ্রোহীদের প্রতি হজরত উসমানের ভাষা ছিল অত্যন্ত অশ্লীল, অকথ্য, অমার্জিত। হজরত আলীও উসমানের অকথ্য ভাষায় গালাগালি থেকে রেহাই পান নি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সাহাবী হজরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) যিনি হজরত ওমর কর্তৃক খলিফা নির্বাচন কমিটির প্রধান হয়ে মিথ্যা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে উসমানকে খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন, সাহাবী হজরত যায়ীদ বিন সাবিত (রাঃ) যাঁকে উসমান তাঁর কোরআন সংকলন কমিটির প্রধান বানিয়েছিলেন, সাহাবী হজরত আমর ইবনুল আ'স, যাঁর কথায় উসমান (রাঃ) ওমরের খুনী পুত্র উবায়দুল্লাহ্‌কে বিনা শাস্তিতে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, এঁরা সহ হজরত আলী (রাঃ) বিদ্রোহী দলের প্রথম সারিতে এসে অবস্থান নেন। গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে রাজধানী সর্বত্র বিক্ষোভের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো। অবস্থা বেগতিক দেখে সিরিয়ার গভর্ণর মোয়াবিয়া খলিফাকে বার্তা পাঠালেন- *'আমিরুল মোমেনিন, আপনি অতি সত্বর সিরিয়া চলে আসুন, মদীনায় আপনার প্রাণের নিরাপত্তা আর নেই, নতুবা সামরীক আইন জারী করুন আমি সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবো।'* খলিফা কোনটাই করলেন না। গণ-অভ্যুথানের হাওয়ায় মদীনা উত্তপ্ত। উসমান টের পেলেন বিপদ আসন্ন। তিনি হজরত আলীর স্মরণাপন্ন হলেন।

পরবর্তি লেখায় শেষ পর্ব-